OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 337 - 343
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 337 - 343
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আনসারউদ্দিনের ‘জন-মুনিষ’ উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতা

ড. সোমা দেব
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, বিলাসীপাড়া মহাবিদ্যালয়
Email ID : somadeb017@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rural Society, Flash Floods, Economic Development, Muslim community, Marginalized People.

Abstract
In his novel ‘Jan-Munish’, Ansaruddin has presented a complete picture of the daily life of Jan-Munish, the lowest level of the rural agrarian society of pre-Green revolutionary period. The novel was published in 2018 in paperback by Abhiyan Publishers. This Ninety five page novel is divided into ten chapters. The background of the novel is Manjilpur village. Manjilpur village is located in the lowlands beyond Gadakhali Dam on the bank of Jalangi. A long embankment runs along Manjilpur to Adamponta. This dam protects Manjilpur village from flash floods.

But like Ansaruddin's other novels, the teenage love does not have happy conclusion. On the last day of Aminuddin's jute harvest, the Gadakhali dam suddenly broke. The team leader of Jan-Munish Gajudafather along with Bahar and his entire team disappeared in the dammed water stream and were never found. This immortality is the destiny of Migrant Agricultural lebour of that era people. Just as disability, disease and old age block people's way of earning, those who are able-bodied also have to face various calamities and die prematurely. The hunger and death of marginalized people in the society in the era of globalization of the 21st century is the same in the village life which is potrait in this novel of Ansaruddin. As a result, the novel Jan Munish is valuable as a unique expression of the social- reality and life reality of marginal peasant society.

Discussion

গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজের সর্ব নিম্নস্তর জন-মুনিষদের দৈনন্দিন যাপনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আনসারউদ্দিন[১] তুলে ধরেছেন তাঁর ‘জন-মুনিষ’ উপন্যাসে। উপন্যাসটি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অভিযান পাবলিশার্স থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পঁচানব্বই পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। বাংলার একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাক্-সবুজ বিপ্লব যুগের প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থায় নিয়োজিত অতি দরিদ্র মুসলমান খেত-মজুরদের জীবন সংগ্রাম ও সমাজ-বাস্তবতার এক নিখুঁত চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন এই ক্ষুদ্রায়তনিক উপন্যাস পরিসরে।

‘সমাজ-বাস্তবতা’ এই শব্দবন্ধে ‘সমাজ’ এবং ‘বাস্তবতা’ দু’টি পৃথক ধারণা সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। ‘বাস্তব’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ— যা প্রকৃত, যথার্থ বা সত্ত্বাযুক্ত বাস্তব জগৎ। অন্যদিকে, ইন্দ্রিয়গোচর এবং সত্য অর্থাৎ ‘True’ বা ‘Real’

অর্থেও ব্যবহৃত হয় 'বাস্তব'[২] শব্দটি। আর বাস্তববাদী-এর সাধারণ অর্থ ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ-ই একমাত্র সত্য - এই মত বা আদর্শ।

'সমাজ' শব্দটির অর্থ ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। তবু সাধারণভাবে বলা যায়, নিবিড় পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে মানুষ যখন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে অভিহিত করা যায়।[৩] সমাজকে যেমন একটি পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত প্রবাহমান ধারা (Social Process)[৪] হিসেবে দেখা হয়। তেমনি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা (Social System)[৫] হিসেবেও গণ্য করা হয়। মানুষের এই সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণ, শ্রেণি, ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা, জীবিকা, সংস্কৃতি, নগর-গ্রাম আর্থিক অবস্থান ইত্যাদি অসংখ্য ভিন্নতার ভিত্তিতে একটি ভৌগোলিক এলাকায় একাধিক ক্ষুদ্রায়তনিক সমাজ গড়ে তুলতে পারে। বিশ্বের বেশির ভাগ রাষ্ট্র-ই যে প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য ক্ষুদ্রায়তনিক সমাজের সমষ্টি সে সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন অনেক সমাজতাত্ত্বিক।[৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে বাস্তববাদী এবং সাহিত্যের বাস্তবতার তাৎপর্য এক নয়। সাহিত্যের বাস্তবতা মুখ্যত উপাদান বা উপকরণের বাস্তবতা কিন্তু দর্শনের বাস্তবতা একটি বহুমাত্রিক ধারণা এবং বৌদ্ধিক আন্দোলনের নাম বা পরিভাষা। যদিও বাস্তববাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখেই সাহিত্যের বাস্তবতা অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে।

উপন্যাসের পটভূমি মঞ্জিলপুর গ্রাম। জলঙ্গির তীরে গদাখালির বাঁধের ওপারের নিম্নভূমিতে অবস্থান মঞ্জিলপুর গ্রামের। মঞ্জিলপুরের গা বরাবর আদমপোঁতা পর্যন্ত চলে গেছে লম্বা বাঁধ। এই বাঁধ মঞ্জিলপুর গ্রামকে বান বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। গদাখালির বাঁধ ভাঙলে মঞ্জিলপুরের বাঁশের মাথার ওপর দিয়ে বন্যার জল বয়ে যায়। তাই —

"গদাখালির বাঁধের উপর মঞ্জিলপুরের মানুষের জান পোঁতা থাকে।"[৭]

মঞ্জিলপুর গ্রামের পাশেই আছে একটা বিশাল অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। এক সময়ে জলঙ্গীর মূল প্রবাহ ছিল ওই হ্রদ। সেই বড় জলাশয়টা ঘিরে গড়ে উঠেছে জেলেদের পাড়া। এই জলাশয়ের স্থানীয় নাম রূপোর বিল। সারা বৎসর এই বিলে হাজার প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

গদাখালির বাঁধের অবস্থা বড়ই নড়বড়ে। বাঁধের ওপরে বাঁশের মাথায় কাঁচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে আদাপিরের দোয়া দরুদের বাণী। লোকবিশ্বাস আদাপির গদাখালির বাঁধকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করবেন। মঞ্জিলপুর গ্রামের মধ্যে বিঘে দেড়েক জমিতে আদাপিরের মাজার। বৎসরের অন্য সময় মনে না পড়লেও বর্ষাকালে আদাপিরের মাহাত্ম্য বেড়ে যায়। তার মাজারের ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। জলঙ্গী যত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে মাজারে লোক সমাগম ততই বেড়ে যায়। মঞ্জিলপুরের মানুষের সমস্ত চাওয়া পাওয়া এই মাজার ঘিরেই আবর্তিত হয়। মঞ্জিলপুর গ্রামের ইমান তাবারকতুল্লা মসজিদের পাশাপাশি এই আদাপিরের মাজারও রক্ষণাবেক্ষণ করে। গ্রামের নানা বিষয়ে মতামত ও দিশা পরামর্শ তাবারকতুল্লাই দিয়ে থাকে। পির সাহেবের প্রকৃত নাম ছিল ওয়াদাপির। লোকমুখে হয়ে গেছে আদাপির। তার কাছে বর্ষাকালে মঞ্জিলপুরের মানুষের একটাই আর্জি যাতে গদাখালির বাঁধ না ভাঙে।

উপন্যাসের শুরু হয়েছে ভাদ্র মাসে। জলঙ্গি তখন টুইটুম্বর। গদাখালির বাঁধ এই ভাঙে কি সেই ভাঙে। মঞ্জিলপুরের বড় চাষী আমিনুদ্দিন। মাঠে তার অনেক জমিতে আউশ ধান পেকে উঠেছে। পাট ও আছে বিঘে দশেক। তার মনে শঙ্কা যদি গদাখালির বাঁধ ভাঙে তবে সব হারাবে। মঞ্জিলপুরের প্রায় সবাই যেহেতু কমবেশি পরিমাণে জমির মালিক তাই সকলেই নিজের নিজের জমির ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত। স্থানীয় স্তরে মুনিষ খাটার মানুষ প্রায় নেই। তাই পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলের বা ডাঙালির থেকে ডেকে আনা হয়েছে মুনিষ খাটার লোকজনদের। আমড়াদহ, হাজিপুর, পেটান্তিপুর, জোয়ানপুর, ভোলাডাঙা, কুমিরডাঙা ইত্যাদি অনুর্বর অঞ্চলের কৃষি মজুরেরা বর্ষাকালে মুনিষ খাটাতে হাজির হয় মঞ্জিলপুরে।

মঞ্জিলপুরের বড় চাষীর বাড়িতে কাজ করতে এসেছে পেটান্তিপুরের গাজু দফাদার এবং তার দলবল। গাজু দফাদার এই মুনিষ খাটা মানুষদের সর্দার এবং উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। পেটান্তিপুরের দরিদ্র কৃষি শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় কাজের অনুসন্ধান করা এবং জনমজুরদের সাথে নিয়ে কাজ সমাধান করা তার পেশা। পেটান্তিপুরের মুনিষ খাটা মানুষেরা গাজু দফাদারের সিদ্ধান্ত যতটা সম্ভব মেনে চলে। সাময়িক মতবিরোধ কখনো কখনো তৈরি হলেও গাজু দফাদারের

সমকক্ষ বিচক্ষণ গ্রামে আর কেউ নেই। আমিনুদ্দিন ভাদ্রমাসে অনেকটা পথ অতিক্রম করে গাজু দফাদারের কাছে এসেছে তার জমির ফসল কেটে তোলার আর্জি নিয়ে। গাজু দফাদার মুনিষদের বাড়ির লোকের খাওয়ার জন্য চাল ডাল অগ্রিম নিয়ে সদলবলে উপস্থিত হয়েছে আমিনুদ্দিনের গ্রামে। অনেকেটা দূরের পথ এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসা যাবে না বলে পেটান্তিপুরের অনেক মানুষই যেতে রাজি ছিল না। কিন্তু সেই ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে যখন তাদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য পর্যাপ্ত চাল ডাল আমিনুদ্দিন পাঠিয়ে দিল তখন পুরো দলটাই তৈরি হয়ে গেল মঞ্জিলপুর যেতে।

গাজু দফাদারের দলের সবচেয়ে কর্মঠো মুনিষ ছিল ন্যাটাপটলা। ন্যাটাপটলা হঠাৎ করে মারা যায়। তার স্ত্রী পরি বেওয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে চরম বিপদে পড়ে। পরি বেওয়াকে গাজুদফাদার প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। মঞ্জিলপুরে যাওয়ার আগের দিন তার বড় ছেলে কিশোর বয়সি বাহারআলি কে নিয়ে পরি বেওয়া উপস্থিত হয় গাজু দফাদারের দরবারে। বাহার চৌধুরীদের ভেড়া চরাতো। চৌধুরীরা ভেড়ার পাল বেচে দিল বাহার কর্মহীন হয়ে পড়ে। বিপন্ন পরি বেওয়া তাই শরণাপন্ন হয়েছে গাজু দফারের এবং আর্জি জানিয়েছেন বাহারকে তার দলে নেওয়ার। পরি বেওয়ার অনুরোধে —

> "ছেলে মানুষ না হোক ভাল মুনিষ হলেই হবে।"[৮]

গ্রামীণ সমাজের একজন হতদরিদ্র মায়ের এই বক্তব্যের মধ্যে সমাজ-বাস্তবতার একটি অত্যন্ত নির্মম দৃষ্টান্ত উঠে আসে। প্রসঙ্গক্রমে গাজুদফাদারের বক্তব্যে উঠে আসে এক ধর্মীয় ব্যাখ্যা —

> "যে ছেলে ভেড়া চরায় সে ছেলে না হয় মানুষ না হয় মুনিষ। তার চেয়ে ছাগল চরানো অনেক ভাল। দীনের নবি একসময় ছাগল চরিয়েছেন। ছাগল চরাতে চরাতে নবি হয়েছেন। তাই ভেড়ার থেকে ছাগলের মান্যতা অনেক বেশি।"[৯]

শেষ পর্যন্ত বাহারকে সাথে নেয় গাজু দফাদার। এই বাচ্চা ছেলেকে সাথে নেওয়ায় দলের অন্যরা যখন দ্বিমত প্রকাশ করেছিল তখন গাজুর বক্তব্য —

> "আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বাপহারা ছেলেটা যদি মানুষ হয়, মুনিষ হয় সেটা কম নয় হে।"[১০]

গাজু দফাদারের এই কথা গুলির মধ্যে তার অভিভাবকত্বের বোধ প্রবল হয়ে ধরা পড়ে। এতগুলো বুভুক্ষু মানুষের দায়িত্ব সে যেন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে।

পেটান্তিপুরের এই দরিদ্র কৃষি শ্রমিকদের একটি বিপরীত চেহারা দেখতে পাওয়া যায় মঞ্জিলপুরে। সেখানকার জমি উর্বরা, ফলে অভাব নেই কারো। মঞ্জিলপুরের যে আমিনুদ্দিনের বাড়িতে তারা কাজ করতে যায় তার দুই স্ত্রী নাগিনা আর ছাকিনা এই জন মুনিষদের আগমনে বিপন্ন হয়ে পড়ে। পেটান্তিপুরের মুনিষদের দুই বেলার খাওয়ার জোগাড় করতে গিয়ে তাদের নাজেহাল হতে হয়। ধান সেদ্ধ করে শুকিয়ে ঢেঁকিতে চাল বানিয়ে তারপর পনেরো জন মানুষের ক্ষুধার্ত পেটকে শান্ত করতে দিশেহারা হয়ে পড়ে তারা। অমিনুদ্দিন সমৃদ্ধ কৃষক। তার কোন কিছুর অভাব নেই। অন্যদিকে, পেটান্তিপুরের জমি অনুর্বর বলে সেখানে ঘরে ঘরে অভাব।

তবুও সমৃদ্ধ মঞ্জিলপুরেও বছিরণ বুড়ির মত অসহায় নিঃস্ব বিধবারা বাস করে। তার একটি মাত্র খাসি ছাগল ছিল। সেই ছাগলের সঙ্গে তার সম্পর্ক আবেগের। সেই ছাগলকেই শেয়ালে খেয়ে নেয় আর দেহের অবশিষ্ট অংশ ফেলে রেখে যায় আমিনুদ্দিনের ধানের জমিতে। একমাত্র ছাগলের মৃত্যুতে বছিরণের যে কান্নাকাটি তা সন্তান হারানোর যন্ত্রণাকেও হার মানায়। শেষে আমিনুদ্দিন তাকে একটা বাচ্চা খাসি ছাগল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে বছিরন খুশি হয়ে বাড়ি চলে যায়। নিঃসহায় বিধবার একটা অবলা প্রাণীর অবলম্বনকে আকড়ে ধরে বেঁচে থাকার যে প্রবণতার কথা উপন্যাসিক বিবৃত করেন তার মধ্যে মনস্তাত্বিক বাস্তবতা এবং সমাজ-বাস্তবতার একটি গভীরতর দিক উন্মোচিত হয়। কিশোর বাহারআলিকে কাজের জন্য নিয়ে আসায় আমিনুদ্দিন তার চেহারা দেখে আপত্তি করলে গাজু দফাদার তার মনিবকে বলেছে —

> "জানবা আমাদের মতো মুনিষখাটার ছেলে মায়ের গভ্ভে থেকে মুনিষ হয়েই বেরুয়।"[১১]

গাজু দফাদারের দল কাজে ফাঁকি দেয় কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমিনুদ্দিন ধান খেতে ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা লক্ষ করে গাজুর বক্তব্য —

> "আমরা যখন কোনো খেতে কাজে লাগি তখন খেত আর গেরস্তের থাকে না। গেরস্তের খেত খোলা নিজের হয়ে যায়।"[১২]

কাজের প্রতি এই দায়িত্ববোধ গাজু দফাদারকে আলদা করে চিনিয়ে দেয়।

মঞ্জিলপুরের ছোট গৃহস্থ আরসাদ! আরসাদের আখ্যানকে আনসারউদ্দিন উপন্যাসে টেনে এনেছেন মুসলিম সমাজ মানসিকতার একটা বৈপরীত্যের চেহারাকে উন্মোচন করার জন্য। আরসাদ সরল সাদা মানুষ। ইসলামের প্রতি গভীর আস্থা থাকা সত্ত্বেও যুক্তিবোধের জন্য কখনো কখনো বেফাঁস কথা বলে দেয়। ফলে ইমাম তাবারকতুল্লার কাছে মাঝে মাঝেই গালি খায় সে। আরসাদের পর পর তিনটি মেয়ে জন্মেছে তাই একটি ছেলের জন্য তার হাপিত্যেশ। পিরের দরগায় সে সবচেয়ে বেশি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে একটি পুত্র লাভের আশায়। আরসাদের এই পুত্র কামনার বাড়াবাড়ি দেখে আমিনুদ্দিন তাকে বলেছে —

> "জানবি পয়গম্বর হজরত মহম্মদেরও ছেলে নেই। সবই মেয়ে। মেয়ের বাবা আল্লাতলার নেকদৃষ্টি পায়।"[১৩]

মুসলমান সমাজে সাধারণ ভাবে মেয়েদের যে সামাজিক অবস্থান এবং মেয়ে সম্পর্কিত সমাজ মানসিকতা তার প্রতি ধর্মীয় যুক্তির আড়ালে একটি প্রতিবাদী ও সংস্কারমুখী মন প্রকাশিত হয় এই বক্তব্যে। আরসাদের পাঁচ পাঁচটি মেয়ে জন্মানোর পর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু তিন মাস বয়সেই সেই পুত্রের মৃত্যু হয়। গ্রামজীবনের মানুষের আশা এবং হতাশা কিভাবে একেকজন ব্যাক্তিকে জীবন সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত করে দেয় তারই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে আরসাদ চরিত্রে। পেটান্তিপুরের খেটে খাওয়া মানুষের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে তারা ডাঙালির মানুষ এবং বন্যায় কখনো বিপন্ন হয় না। সাঁতার না জানলেও সমস্যার কিছু নেই। জলের অভাবে ডাঙালির জমি অনুর্বর। ভয়ঙ্কর ক্ষুধা তাদের নিত্যদিনের সহচর। তবু আব্দুল বলে—

> "দরকার নেই নদী-নালা, খাল-বিলের। আমরা ডাঙা দেশের মানুষ। খাই না খাই শুকনো ডাঙায় থাকি। বান আসলে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় ভেসে বেড়াব?"[১৪]

তবু ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য গদাখালির বাঁধ ভাঙার প্রবল সম্ভাবনার মধ্যে তাদেরকে নাবালে কাজ করতে আসতে হয়। লেখকের বর্ণনায়—

> "পেটান্তিপুরের এক জগ্গর ক্ষুধার্ত মুনিষ যেমনভাবে ভাতের ভারার অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে অমনভাবে কোনো ইমানদার মানুষ ইদের চাঁদ দেখার জন্য তাকিয়ে থাকে না।"[১৫]

গাজু দফাদার এবং তার দলবল আমিনুদ্দিনের আউশ ধানের ক্ষেতে দুপুরবেলার ভাত খাওয়ার সময় যে কথাগুলো বলে তাতে গ্রামীণ সমাজের বাস্তব জীবনবোধ এবং হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের দিকটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে। দফাদারের দলের একজন সদস্য খাওয়ার মুখে তোলার আগে গাজুকে জিজ্ঞেস করে —

> "ও গাজু ভাই, বিছমিল্লা বলে খাব?"[১৬]

গাজুদফাদারের মাথা গরম হয়ে ওঠে। তার কথায় —

> "তোদের মুখে লাথি মারি হারামির বাচ্চা। গেরস্তের খাবি, তাতে আবার বিছমিল্লা বলার কী আছে? জানিস, বিছমিল্লা বলে খেলে অল্প ভাতে পেট ভরে যায়।"[১৭]

ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে নজে ও ফজে অনুযোগ করে দফাদারকে বলে খাওয়ার আগে বিছমিল্লা বলাটা মোছলমানদের চিরাচরিত নিয়ম। গাজু এই কথায় আরও তেতে ওঠে। সে স্পষ্ট করে জানায় —

> "মুনিষখাটা মুনিষখাটা। মুনিষখাটার আর হেঁদু মোছলমান কী। পেট ঠেসে খাওয়ার জন্যিই দেশ গাঁ পেরিয়ে এখানে মুনিষে আসা। বিছমিল্লা বলে খেলে গেরস্তের ভাত বাঁচবে, আমাদের কী লাভ তাতে? জানবি বিছমিল্লা বলবি ঘরের ভাতে, পরের ভাতে নয়।"[১৮]

গাজুর দু'একটি বক্তব্যে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনবোধ কর্মবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক মনন প্রকাশিত হয়ে যায়। যে শ্রেণি সচেতনতা এবং শ্রেণি বিভেদের বোধ এখানে উঠে আসে তা মার্ক্সীয় সামাজিক শ্রেণি বিভাজনের তত্ত্ব থেকে উৎসারিত নয়। গাজুর প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা নিসৃত জীবনবোধই এই বক্তব্যের আধার।

নাবালের কাজ শেষে মজুরির হিসাব মিলিয়ে গাজুর দল পেটান্তিপুরে ফিরে যায়। পেটান্তিপুরের ভয়ঙ্কর অভাব আর কর্মহীনতার মধ্যেও প্রতিদিন পালা করে এই অভাবী মানুষগুলোকে কাজ খুঁজে দেয় গাজু। পেটান্তিপুরে সমৃদ্ধ চাষীর সংখ্যা খুবই কম। চাষ আবাদও জলের অভাবে তেমন ভালো হয় না। অপরদিকে মুনিষ খাটা লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে, প্রতিদিন সবার কাজ জোটে না। কিন্তু সবাই সকালবেলায় গাজু দফারের উঠোনে হাজির হয় কাজের আশায়। বাস্তব পরিস্থিতি এবং পরিবারের ক্ষুধার্ত পেটের সংখ্যা বিবেচনা করে গাজু একদিন একেকজনকে কাজ দেয়। গাজু নিজেও এই শ্রেণির-ই একজন। যেদিন কাজ নেই সেদিন তাকেও অনাহারে কাটাতে হয়। নিজে অনাহারে থেকেও অন্যের প্রয়োজন পুরণে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে মুনিষ নির্বাচন করে সে। তার অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এবং দায়িত্ববোধ একজন যথার্থ জননেতার পরিচয় বহন করে।

উপন্যাসে ক্ষুধা কাতরতার এক বিবর্ণ চেহারা অঙ্কিত হয়েছে পরিবেওয়া ও তার ছেলে বাহারআলির আখ্যানকে কেন্দ্র করে। পরি ন্যাটাপটলার বিধবা স্ত্রী। মাঠের কচু-ঘেচু, শাক লতা পাতা কুড়িয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার এক কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত সে। পেটান্তিপুরের বড় চাষীরা তাদের জমির মটর, ছোলা ও অন্যান্য ফসল গবাদি পশু ও মানুষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দুরমুশ মিয়া নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করে 'মাঠ রাখাল' হিসেবে। নিরুপায় পরি একদিন মাঠে শাক তুলতে গেলে দুরমুশ মিয়া তার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে গাঁয়ের তেমাথায় নিয়ে আসে। এবার গাঁয়ের মনিব শ্রেণির মানুষেরা দুরমুশকে ওই কাজের জন্য তিরস্কার করলে সে জানায় 'মাঠ রাখাল' হিসেবে সে দায়িত্ব পালন করছে মাত্র। ফলে, মনিবেরা পরি বেওয়াকেই বকাঝকা করতে শুরু করে—

> "ঘরের বউ মাঠে যাও কেন বাপু? যদি কোনো অঘটন ঘটে কী করে সমাজে মুখ দেখাতে? কার কাছে বিচার চাইতে? বেহায়া কোথাকার?"[১৯]

মনিবদের এরকম কথায় উৎসাহিত হয়ে দুরমুশ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে—

> "শোনো মোড়ল, অঘটন আমি ঘটাতে পারতাম। ঘটাইনি।"[২০]

গ্রাম্য সমাজে অসহায় নিঃস্ব বিধবার এই প্রকাশ্য লাঞ্ছনা ও অপমান গ্রামীণ সমাজ-বাস্তবতার একটি ভিন্নতর অভিমুখ চিহ্নিত করে দেয়। যদিও বাহার আলি বড় হয়ে সেই ছোলা ক্ষেতেই মুনিষ হিসেবে কাজ করতে গেছে এবং মনিব তার কর্ম দক্ষতায় খুশি হয়ে 'হুড়াপোড়া' খাওয়ার জন্য একআটি ছোলা উপহার দিয়েছে। সন্ধেবেলা পরের বাড়ি থেকে পাটকাঠিতে আগুন এনে উঠোনে সবাই মিলে ছোলার ডাল গুলিকে পোড়ানো এবং পোড়া শেষে আগুন নিভে গেলে অন্ধকারে হাতরে হাতরে ছোলার ছিম খুলে মুখে দেওয়া এই হুড়াপোড়ার রীতি। অন্ধকারে বিধবা পরি ছোলা খুঁজতে খুঁজতে তার ছেলে মেয়েদের প্রত্যেকের পারস্পরিক হাতের স্পর্শ পায়। এই স্পর্শের মধ্যে দিয়ে মানবীয় সম্পর্কের এক আবেগময় পরিসর গড়ে ওঠে। পরির চোখে জল আসে, তার মৃত স্বামীর কথা মনে পড়ে। প্রেতলোকে যাওয়া স্বামীকে হুড়াপোড়ার ছোলা খাওয়ানোর জন্য ছেলে বাহার আলিকে পরামর্শ দেয় কয়েকটি ছোলার দানা দুপায়ের ফাঁকা দিয়ে পেছন দিকে ছুঁড়ে দিতে। তাদের গ্রামীণ বিশ্বাস এই পদ্ধতিতে প্রেত বা শয়তানকে খাবার দিতে হয়।

মঞ্জিলপুরে আমিনুদ্দিনের বাড়িতে একবার দক্ষতার সঙ্গে কাজ সমাধা করে আসার পর প্রতি বর্ষায় গাজু দফাদারদের দলের কাজ সেখানে পাকা হয়ে যায়। বাহার আলি যখন দক্ষ মুনিষ তখন গাজু দফাদারের সঙ্গে পুনর্বার মঞ্জিলপুরে যায়। সেবারে আরসাদের বড় মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। আমিনুদ্দিনের তেরো বিঘা জমির ধান তারা তিনদিনে কেটে ঘরে তুলে দেয়। একমাত্র শিশু পুত্রের অকাল মৃত্যুতে আরসাদ যখন বিপন্ন তখন গাজুর দলবল বিনা পারিশ্রমিকে একদিন আরসাদের জমির ধান কেটে তার বাড়িতে তুলে দিয়ে আসে। এরপর আরসাদের বড় মেয়ে আর বাহার আলির সম্পর্ক আরও গভীর হয়। কিন্তু আনসারউদ্দিনের অন্যান্য উপন্যাসের মতোই এখানেও এই কিশোর প্রেম পরিণতি পায় না। আমিনুদ্দিনের পাট কাটার শেষতম দিনে হঠাৎ সশব্দে গদাখালির বাঁধ ভেঙে যায়। বাহার সহ গাজুদফাদার

এবং তার পুরো দলবল বাঁধভাঙা জলস্রোত কোথায় হারিয়ে যায় আর তার সন্ধান মেলে না। এই অপমৃত্যুই মুনিষখাটা মানুষের নিয়তি। কর্মহীনতা ব্যাধি জরা বৈকল্য বার্ধক্য যেমন মুনিষখাটা মানুষের উপার্জনের পথ বন্ধ করে দেয়, তেমনি যারা কর্মক্ষম তাদেরকেও নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে অকালে মৃত্যু বরণ করতে হয়। সমাজের প্রান্তিক মানুষের ক্ষুধা এবং অপমৃত্যু একুশ শতকের বিশ্বায়নের যুগেও একই ভাবে গ্রাম জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সঞ্চারিত হয়ে আছে আনসারউদ্দিনের এই উপন্যাসে তারই বাস্তবতাকে তুলে ধরা। ফলে জনমুনিষ উপন্যাসটি প্রান্তিক কৃষক সমাজের সমাজ ও জীবন বাস্তবতার এক অনন্য প্রকাশ হিসেবে মূল্যবান।

আধুনিক যন্ত্রনির্ভর কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা প্রচলনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে গ্রামীণ কৃষি নির্ভর জীবনের এক ডকুমেন্টারি চিত্র এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। পরিযায়ী কৃষি-শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার সমস্যা অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে বিবৃত ও বিধৃত হয়েছে এখানে। বাংলার জনসংখ্যার ঘনত্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। কৃষিজীবী মানুষের অনুপাতে জমির পরিমাণ খুব কম। সাধারণভাবে বাংলাকে সুজলা-সুফলা বলা হলেও সমগ্র বাংলার মাঠ ঘাটের জমির গুণগত মান এবং উর্বরা শক্তি সমান নয়। কিন্তু উর্বর-অনুর্বর সর্বত্রই কৃষিজীবী মানুষের বসবাস রয়েছে। প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন ক্ষেত মজুরেরা নিজেদের এলাকায় বছরের কিছুটা সময় কাজ পেলেও সারা বছর এক জায়গায় তাদের কাজ জোটে না। তাই অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অঞ্চলের কৃষি শ্রমিকেরা দল বেঁধে দূরের সমৃদ্ধ গ্রামগুলিতে যায় চাষের জমিতে কাজ করতে। এটা খুব স্বাভাবিক একটা গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাপনায় পরিযায়ী শ্রমিক যারা জীবিকার সন্ধানে ঘরে পরিবার রেখে বাইরে যায় দু'পয়সা রোজগারের আশায় তাদের যাপন অভিজ্ঞতা সব সময় সুখকর হয় না। এই উপন্যাসে গাজু সর্দারের দলের লোকেদের পরিণতি হয়েছে নির্মম। তারা যখন ভিন গাঁয়ের নাবাল জমিতে কাজ করছিল ভরা ভাদ্রে তখন হঠাৎ গদাখালির বাঁধ ভেঙে বাঁশ সমান উঁচু জলের স্রোত এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ডাঙালির মানুষ বেশির ভাগই সাঁতার জানে না। তাদের লাশ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ কাহিনি শুধু গাজু সর্দার ও তার দলেরই নয়, দেশের লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের অভিজ্ঞতার কাহিনি এটাই। উন্নয়ন, বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক ঢক্কা-নিনাদ যথেষ্ট পরিমাণে হলেও স্থানীয় স্তরে কর্মের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রচেষ্টা বা নীতি প্রণয়ন কেউই করেনি আজও।

আনসারউদ্দিনের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও নায়ক বাহার আলি সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হওয়ার এই চরিত্রে কল্পনা-প্রবণতা, সুকুমার মনোবৃত্তি, বয়সোচিত চপলতার সংসারের কঠিন দায়ভারে একেবারে সংযত। তাঁর গল্প উপন্যাসের নায়িকারাও প্রায় কিশোরী, তাদের প্রেম পূর্ণতা পায় না নানা পরিস্থিতিগত কারণে। কথাসাহিত্যিক আনসারউদ্দিন স্বয়ং তাঁর গল্প উপন্যাস-এর নায়িকাদের প্রসঙ্গে গৌতম সাহাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন —

> "আমি মূলত গ্রাম সমাজের একেবারে নিম্নবিত্তের মানুষকে আশ্রয় করে সাহিত্য নির্মাণ করার চেষ্টা করি। এই শ্রেণির নারীদের তেমন শারীরিক সৌন্দর্য নেই বা শারীরিক সৌন্দর্যের বেসাতি করি না আমি। যা করলে পাঠককে কিছুটা টেনে রাখা যায়। আমার সাহিত্যে নারীরা রূপচর্চার দিক থেকে ভীষণ পিছিয়ে। সে কারণে বইয়ের প্রচ্ছদে তাদের শরীরের বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয় না। তাদের মাথার চুল কাঠবেড়ালির বাসার মতোই শ্রীহীন। মাথায় উকুন। মুখে মেচেতার দাগ। ফাটা পা। শীতকালে এই ফাটল আরো চওড়া হয়। সেই ফাটলে চোখ রাখি। তা দেখে তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার ছবি আঁকি।"[২১]

আনসারউদ্দিনের কথাসাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপটিকে চিনে নিতে এই মন্তব্যের পর আর আলোচনা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন।

Reference:

১. আনসারউদ্দিন, হেঁশেল জীবন, প্রথম প্রকাশ, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ব্লার্ব অংশ।
(আনসারউদ্দিনের জন্ম ১৯৫৯ সালে, নদিয়া জেলার শালিগ্রামে। বাবা আশিরুদ্দিন মণ্ডল, মা মহিলা খাতুন বিবি। ১৯৮০-তে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে স্নাতক। পেশায় প্রান্তিক কৃষক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বারোর বেশি। পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি সোমেন চন্দ পুরস্কার, অন্নদাশংকর রায় স্মারক পুরস্কার, গল্পমেলা পুরস্কার, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন ও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 337 - 343
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গবেষণাকেন্দ্র পুরস্কার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইলাচন্দ পুরস্কারসহ একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা। আনসারউদ্দিনের শখ বই পড়া, নেশা সংবাদপত্র পাঠ ও খবর শোনা। বর্তমানে থাকেন নদিয়ার ধুবুলিয়ায়।)

২. চক্রবর্তী, শুভাশিস (সম্পাদক), অহর্নিশ পত্রিকা, অক্টোবর, ২০১৮, পৃ. ৩

৩. ইসলাম, আজাহার, সাহিত্যে বাস্তবতা, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২১

৪. Abrams, M.H., & Harpham, Geoffrey Galt, A Glossary of Literary Terms, Tenth Edition, Cengage Learning, Delhi, 2012, P. 334

৫. Buchanan, Ian, Oxford Dictionary of Critical Theory, First Published, Oxford University, Press, New York, 2010, PP. 439 - 441

৬. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, প্রথম প্রকাশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৬

৭. আনসারউদ্দিন, জন-মুনিষ, প্রথম প্রকাশ, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৮

৮. তদেব, পৃ. ২৯

৯. তদেব, পৃ. ৩০

১০. তদেব, পৃ. ৩৩

১১. তদেব, পৃ. ৪৬

১২. তদেব, পৃ. ৪৭

১৩. তদেব, পৃ. ৫৩

১৪. ভদেব, পৃ. ৫৫

১৫. তদেব, পৃ. ৫৪

১৬. তদেব, পৃ. ৫৭

১৭. তদেব, পৃ. ৫৮

১৮. তদেব, পৃ. ৫৮

১৯. তদেব, পৃ. ৭২

২০. তদেব, পৃ. ৭২

২১. সাহা, গৌতম, আনসারউদ্দিন অনন্য সন্ধান, প্রথম প্রকাশ, নান্দনিক, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২৫৬